কাব্যগ্রন্থ

কাব্যনাটক

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
BE
বেঙ্গলিইবুক.কম
bengaliebook.com
★2022★

সূচিপত্র

প্রাণের প্রহরী (কাব্যনাটক)...2

মালঞ্চমালা – কাব্যনাটক.. ২০

প্রাণের প্রহরী (কাব্যনাটক)

[একজন ডাক্তারের চেম্বার। সাহেবপাড়ায়। সন্ধের পর এ অঞ্চল নিঝুম হয়ে আসে। চেম্বারটি বেশ প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন। টেবিল ও অনেকগুলি চেয়ার ছাড়াও একটি কালো রেক্সিনে মোড়া গদির বিছানা। সেখানে দু' জন বয়স্ক যুবক বসে আছে। এদের নাম প্রতীক ও সংবরণ। এরা অপেক্ষা করছে ডাক্তারের জন্য, নিচু গলায় কথা বলছে।

ডাক্তারের দশাসই চেহারা। গলার আওয়াজ গমগমে। তাঁর নাম হৃষীকেশ। সবাই ঋষি বলে ডাকে। তিনি একটু চেঁচিয়ে কথা বলেন, অনেকটা নাটুকে ধরনের। তিনি প্রকৃতপক্ষে একটি প্রৌঢ় চেহারার শিশু।]

.

দূর থেকে ডাক্তারের গলার আওয়াজ শোনা যায়:
ব্যাপারটা কী? ব্যাপারটা কী? ব্যাপারটা কী?
প্রতীক : ঐ আসছে ঋষি, সারা পাড়াটা কাঁপিয়ে
সংবরণ : সারাদিন এত খাটনি, তবু ওকে ক্লান্ত হতে
দেখি না কখনও!
ডাক্তার: ব্যাপারটা কী হে! সব এত চুপচাপ
বসে আছো কেন? দূর থেকে ভাবলাম
কেউ নেই, আলো জ্বলছে, যেন কোনও বাগানের মধ্যে একটা
ঘর।
কী রে সংবরণ, তুই কী যেন ভাবছিস মনে মনে?
প্রতীক: চুপচাপ থাকব না কি নাচানাচি করব দু'জনে?
কতক্ষণ ঠায় বসে আছি!
সংবরণ: আর ঠিক পাঁচ মিনিট দেখতাম, তারপর ভাই

কেটে পড়তাম।
ডাক্তার: আরে বোস বোস, এত রাগারাগি কেন,
আমি একা বহুক্ষণ এখানে ছিলাম। এ সময়
কোনও সুস্থ মানুষের দেখা পেতে খুব মন চায়
সারাদিন রুগি আর রুগি!
কটা বাজল?
প্রতীক: সাড়ে আটটা, না, না, তার পাঁচ মিনিট কম
ডাক্তার: যথেষ্ট হয়েছে! আজ রুগি দেখা এখানে খতম!
কানাই, কানাই, কেউ এলে বলবি, আটটার পর
সব অসুখের ছুটি। আমি নেই, দরজা বন্ধ কর,
এখন আনন্দ হবে, ফুর্তি হবে...
কে ওখানে?
সংবরণ: কেউ না তো?
ডাক্তার: মনে হল একটা ছায়া
সংবরণ: কিছু নেই।
ডাক্তার: ওফ এক পার্শি মহিলাকে দেখে আসছি এক্ষুনি,
মাগীর অসুখ নেই কোনও
সংবরণ: ল্যাঙ্গোয়েজ! ল্যাঙ্গোয়েজ
ডাক্তার: যত বলি, মা জননী। তোমার তো অসুখ কিচ্ছু না!
ঘ্যানোর ঘ্যানোর করে তবু বলে, ডাক্তার, আমায় তুমি
ঠিক মতন ওষুধ দিচ্ছ না!
এখানে সেখানে ব্যথা, প্রতিদিন ঘুম যাচ্ছে কমে,
টাকার বান্ডিল, অতি বড়লোক ঘুম হয় টাকার গরমে?
প্রেসার নর্মাল, স্টুল, ইউরিন, কিংবা রক্তে চিনি,
সমস্ত পরীক্ষা করে দেখা হল, স্বাভাবিক। তবু

প্রতিদিনই
ডাক পড়ে
প্রতীক: আহ্ ঋষি, রাত্তির অনেক হল, আমরা এখনও
পেচ্ছাপ বাহ্যির কথা শুনব? এর মানে হয় কোনও?
ডাক্তার: না, না, ফুর্তি হবে, আজ ফুর্তির দরকার
আমারই সবচেয়ে বেশি। কে ওখানে?
সংবরণ: কেউ না তো?
ডাক্তার: মনে হল, ঠিক যেন কোনও
মেয়ে, বারবার ভুল হয়ে যাচ্ছে কেন এ রকম?
প্রতীক: টাকার ধান্দায় রোজ এত পরিশ্রম!
এরপর চোখে সর্ষেফুল দেখবে কোন্‌দিন, ঋষি!
ডাক্তার: (নিচু গলায়, আগেকার ভাষায় যাকে বলা হত
জনান্তিকে। অর্থাৎ তার এ কথাটা অন্য কেউ শুনতে
পাবে না)।
না, না, সে রকম নয়। বাবলুর অসুখের পর
একটি মেয়ের ছায়া দেখতে পাই কদিন অন্তর
চুপ করে দরজার পাশে এসে নিঃশব্দে দাঁড়ায়
আবার চোখের এক পলক ফেলার আগে চলে যায়
আমি তো চিনি না, ও কে?
প্রতীক: মেয়েটি কেমন দেখতে?
ডাক্তার: (চমকে) কোন মেয়েটি?
প্রতীক: ঐ যে পার্শি মেয়েছেলে, যার কথা তুমি বলছিলে!
ডাক্তার: অসুন্দর পার্শি আমি এ পর্যন্ত দেখিনি কখনও,
ডাক্তারি শাস্ত্রের মতে যে শরীরে রোগ নেই কোনও
তবুও অসুখ থাকে সেখানেও। এই যে মহিলাটি,

রোগ নেই, তবু তিনি অসুস্থ যে সে কথাও খাঁটি।
সংবরণ: তোমাদের প্রচণ্ড সুবিধে,
শুধু ভাই আমাদেরই যা কিছু দুর্ভোগ
যে অসুখ সারাতে পারো না, বলে দাও,
ওটা মানসিক রোগ!
ডাক্তার: হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! সকলেরই খুব রাগ ডাক্তারের প্রতি,
অথচ ডাক্তার ছাড়া চলেও না, কিছু হলে কাকুতি মিনতি!
অন্যান্য সময়ে দুর শালা!
মনের অসুখ চিনে নিতে
ভুল তো হতেই পারে। ইচ্ছে আছে এই মনটাকে
একদিন ঠেসে ধরব ল্যাবরেটরিতে।
পঞ্চভূত মানুষের দেহে
ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু আর ব্যোম। অত্যন্ত সস্নেহে
শরীর এদের পোষে। এর মধ্যে পঞ্চমটি বাদে
বাকি চারটিকে ঢের নেড়ে চেড়ে দেখা হয়ে গেছে,
কিন্তু গোল বাধে
অদ্ভুত জিনিসটি নিয়ে, ঐ ব্যোম, অর্থাৎ শূন্যতা
তার কোনও দিশা নেই, কোনও শাস্ত্রে নেই তার কথা।
সংবরণ: রবীন্দ্রনাথের লেখা আছে এ বিষয়ে, সে সব পড়োনি বুঝি?
তা পড়বে কেন? ডাক্তারেরা বই-টই পড়েন না। শুধু মাত্র
রুজি-রোজগারের ধান্দাতেই মত্ত সমস্ত সময়
প্রতীক: সারা দিনে অ্যাভারেজ ঠিক কত হয়?
দশ, বিশ হাজার, না বেশি?
ডাক্তার: বাজে কথা বোলো না হে! প্রতিদিন দশ কি বারোটি
গ্রন্থপাঠ করি আমি। মানুষের নোখ থেকে মাথার করোটি,

হাড় মজ্জা রক্তের জীবন, এর চেয়ে বড় আর গ্রন্থ আছে?
প্রতীক: এ সমস্ত সস্তা দার্শনিকতা দিয়ে কি পেট টেট ভরবে ভাই?
ঢের হল! মালকড়ি ছাড়ো কিছু মাল-টাল খাই?
ডাক্তার: হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফুর্তি হবে, আজ ফুর্তির দরকার
আছে খুব আমার নিজেরই। মন ভালো নেই।
দিতে হবে এক ডুব ফুর্তির সাগরে কিছুক্ষণ।
.
(বোতল থেকে মদ ঢালা হয়। তিন বন্ধু চিয়ার্স বলে পান শুরু করে।)
ডাক্তার: কে, কে কে ওখানে?
প্রতীক: জ্বালালে দেখছি আজ? থেকে থেকে বারবার কে, কে?
ভুল হতে হতে তবু মানুষ তো খানিকটা শেখে!
রাত্তিরে ঘুমোও না বুঝি?
ডাক্তার: না, না, ভুল নয়, খুব স্পষ্ট চোখে দেখা
বাবলুর অসুখের পর থেকে
সংবরণ: বাবলু, তোমার ছেলে,
তার কী হয়েছে?
ডাক্তার: কী হয়েছে...
আমি নিজেই যে
জানি না উত্তর–
প্রতীক: ধুত্তোর!
খালি শুধু অসুখ,
অসুখ!
[নেপথ্যে একজন কেউ ডাকল, ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু! নদীতে মাঝিরা যে-রকম সুর করে করে জল মাপে, সেই রকম কণ্ঠস্বর।]
সংবরণ: ঐ তো এসেছে কেউ

প্রতীক : ফের কোনও রুগি-টুগি
সংবরণ: এ লোকটিই বহুক্ষণ থেকে আছে দরজার পাশে?
ডাক্তার: না, না, এ সে নয়। একে জানি, চিনি এর
গলার আওয়াজ
মাঝে মাঝে আসে। সাত দিন পর আবার এসেছে বুঝি আজ।।
[আগন্তুকের প্রবেশ। বৃদ্ধ, মুখে সাত দিনের পাকা দাড়ি। একটা রংজ্বলে-যাওয়া নীল জামা গায়, সে আর কারুর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে শুধু ডাক্তারের দিকে চেয়ে থাকে।]
আগন্তুক: ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু?
ডাক্তার: কে, ধরণী?
আবার এসেছ, তুমি এখনও মরোনি?
আগন্তুক: (সাগ্রহে) মরব, ডাক্তারবাবু?
ডাক্তার: মরার কি অন্য কোনও জায়গা পেলে না?
আমার কাছেই বুঝি আছে শুধু দেনা?
আগন্তুক: মরব, ডাক্তারবাবু?
ডাক্তার: সাত দিন কোথা ছিলে? ফের চাড়া দিয়ে উঠে এলে?
আগন্তুক: মরব, ডাক্তারবাবু?
ডাক্তার: চুপ করো! মরণের উচ্চারণ এখানে নিষেধ!
[ডাক্তার পকেট থেকে তিরিশ-চল্লিশটা টাকা বার করে দিলেন। লোকটি কোনও কৃতজ্ঞতা বা নমস্কার না জানিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল।]
প্রতীক: কী ব্যাপার লোকটাকে দিলে এত টাকা?
আমাদের ফুর্তির খোরাক সব ফাঁকা?
সংবরণ: আগেও দেখেছি, তুমি ঐ বুড়োটাকে টাকা দাও,
ব্ল্যাকমেল নাকি?
ডাক্তার: ব্ল্যাকমেলই বটে! এই বুড়ো লোকটি প্রাক্তন নাবিক,
ছিল জলে ভ্রাম্যমাণ। এখন ডাঙায় এসে দিক

হারিয়েছে। ও চেনে না শহরের বাঁধা পথ; মাটির নিয়ম
ও জানে না। সংসারের বুদ্ধি ওর কম
ও বোঝে না নিজের সুবিধে
বাড়িতে পাঁচটি বাচ্চা, রোগা বউ, আর আছে খিদে
বেকারের খিদে পাওয়া অতি বড় দোষ
বেকারের সন্তানের খিদে পাওয়া আরও বেশি দোষ!
প্রতীক: আবার দুঃখের গপ্পো! আজ শুধু অনন্ত ঝামেলা।
ডাক্তার: না, না, না, না; এবারই তো শুরু হবে খেলা!
সংবরণ: ও বেকার, কিন্তু তুমি কেন দিতে যাবে ওর অন্ন?
তুমি কি সমাজ? নাকি রাষ্ট্র? নাকি খোদ দাতা-কর্ণ?
ডাক্তার: সে সব কিছু না।
আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনচর্যায়
এ রকম ফাঁক থাকে। ঐ লোকটা শূন্য-হাতে বাড়ির দরজায়
যদি ফেরে, ঠিক পাখির ছানার মতো, পাঁচটি হাঁ-করা মুখ
মেলে আছে। ওরা রোগী, এর নাম খিদের অসুখ!
ও তো পয়সা চায় না,
বিষ চায়! দু-তিন বার ওর বাড়ি গেছি।
যা দেখেছি,
মনে হয়, এতকাল বইপত্রে যা কিছু শিখেছি
সেখানে উত্তর নেই এ সব প্রশ্নের।
এ পর্যন্ত খিদের ওষুধ কিছু বেরিয়েছে? তবে?
নাকি বিষ দেব?
আমি তো ডাক্তার, কিছু একটা দিতে হবে–
প্রতীক: ওসব বাতেলা ছাড়ো, মাল আনো
মালের উৎসবে

বুঁদ হয়ে থাকি! তুমি অতি বুদ্ধ তাই এখনও উত্তর
চাও, এখনও বিবেক নিয়ে প্যানপ্যান করে চলেছ, ধুত্তোর
ডাক্তার: কানাই, নিয়ায়, আরও মাল আন্ আজ ফুর্তি করি,
মন ভালো নেই
আমার নিজের ছেলে হাসপাতালে দিনের পর দিন...
সংবরণ: এমন ফুটফুটে ছেলে, তার কিছু হতেই পারে না
ডাক্তার: সুইডেন থেকে তার জন্য কিছু অ্যামপিউল কেনা
বিশেষ দরকার
প্রতীক: মাই সান, মাই এক্সিকিউশানার
ডাক্তার: (চমকে) তার মানে?
প্রতীক: ওরে পুত্র, জল্লাদ আমার!
ডাক্তার: কার পুত্র? কে জল্লাদ?
প্রতীক: প্রত্যেক পিতার পুত্র, পিতার জল্লাদ
এক ছোকরা এই নিয়ে লিখেছে কবিতা।
দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু, আর দিনে দিনে বড় হয় ছেলে
আর তুমি, তার পিতা ততই মৃত্যুর দিকে যাও তুমি হেলে!
ডাক্তার: এক্ষেত্রে আমিই বুঝি পুত্রহন্তা, সেই বুঝি ভালো...
মাত্র নবছর, এর মধ্যে মৃত্যু শিয়রে দাঁড়াল।
একি প্রতিশোধ?
আমি বহুবার বহু বাড়ি থেকে
মৃত্যুকে ফেরাই
মরণের সঙ্গে হয় পাশাখেলা
আমি জিতে যাই
তাই মৃত্যু এবার কি জাল ফেলে ছেঁকে
আমারই সংসারে দেবে থাবা?

সংবরণ: কী রকম আছে বাবলু?
যখন ঘুমন্ত থাকে, ভালো থাকে,
হাসে, কথা বলে,
সত্যিই ঘুমের মধ্যে হাসে কথা বলে। যখনই সে জেগে ওঠে,
অসহ্য যন্ত্রণা,
যেন কাকে দ্যাখে
ক্যাবিনের বাইরে, কেউ নেই তবু দ্যাখে
সংবরণ: কী ঠিক অসুখ ওর?
ডাক্তার: নেটিক সিভ্রম। তোমরা ঠিক বুঝতে পারবে না,
দুটি কিডনিতেই ওর অজানা অসুখ
সংবরণ: অজানা অসুখ?
ডাক্তার: আশ্চর্য হলে কি? শুধু মন নয়,
মনুষ্য শরীরে
এখনও অচেনা কিছু রয়ে গেছে
প্রতীক: বিশ্বাস করি না! তুমি চিকিৎসা ছেড়ে মন্ত্রট নাও
সংবরণ: কিডনির অসুখ? আজকাল প্রায়ই শুনি
মাদ্রাজে ভেলোরে,
চমৎকার সেরে যায় সব...
প্রতীক: আরও একটু সরে
হোয়াইট ফিল্ড গ্রামে যাও, সাধু সন্ন্যাসীর দেওয়া ছাই ভস্ম,
হাওয়া থেকে ফুল...
ডাক্তার: ও সমস্ত কথা থাক, এসো খাই
সংবরণ: ঋষি, তুমি বড়ই অস্থির হয়ে আছো ভাই
ডাক্তার: হয়তো বাঁচানো যায়, আজ থেকে মাস দেড়েক আগে
ডাক্তার লোম্যান নামে একজন সেন্ট পিটার্সবার্গে

পরীক্ষা চালিয়েছেন বাঁধা-মৃত্যু দশ জন রোগীর শরীরে
নতুন ওষুধ কিংবা বিষ-ফল, ঠিক যেন মেঘ চিরে
হঠাৎ বিদ্যুৎ কিংবা বজ্রপাত কিংবা আশীর্বাদ,
শুভ কিংবা অশুভ সংবাদ...
পাঁচ জন বেঁচে গেছে, পাঁচটি বাঁচেনি!
সংবরণ: পাঁচ জন বেঁচে গেছে, পাঁচটি বাঁচেনি?
এ যে সাংঘাতিক
একি সার্থকতা নাকি ব্যর্থতারই আর এক দিক
ডাক্তার: যাক আর ও কথা নয়। ভুলে থাকতে চাই।
ফুর্তি হোক। শালা মরণের মুখে ছাই
দাও, তুড়ি মারো, এই তো এসেছে, সব গ্লাসে ঢালো
কে ওখানে?
কে ওখানে?
[ঝনঝন করে গেলাস ভাঙার শব্দ ও জলতরঙ্গ বাজতে থাকে।]
প্রতীক: কেউ নেই, কাছাকাছি আর কেউ নেই
সংবরণ: আমরা তো কিছুই দেখছি না
একসঙ্গে
ডাক্তার: আমিই কি শুধু দেখি? মনে হয় যেন খুব চেনা
একটি নারীর কণ্ঠস্বর: ঋষি, ঋষি
ডাক্তার: কে তুমি? তুমি কে?
প্রতীক: ঋষি, তুই এত চ্যাঁচাচ্ছিস কাকে দেখে?
নারীকণ্ঠ: ঋষি ঋষি
ডাক্তার: কে তুমি? দেখাও মুখ, এসো, কাছে এসো
নারীকণ্ঠ: আমি তো রয়েছি ঠিক তোমারই সম্মুখে
ডাক্তার: কুয়াশায় ঢাকা কেন, কায়া নেই বুঝি?

শুধু যেন ছায়া
নারীকণ্ঠ: চোখের কুয়াশা! ঋষি, এসো একবার
তুমি আর আমি শুধু মুখোমুখি বসি
দু'জনে মনের কথা এক মনে বলি
ডাক্তার: তোমাকে চিনি না, তবু দু'জনে মনের কথা হবে বলাবলি?
তুমি কোনও পাগলিনী বুঝি?
পাগলা গারদ থেকে পালিয়ে এসেছ?
প্রতীক: আমাদের বন্ধুটি যে একা একা কথা বলছে
হঠাৎ পাগল হল নাকি।
সংবরণ: ঋষি, তোর কী হল, কী হল?
ডাক্তার: তোরা আয় তো মেয়েটাকে ধরি
নারীকণ্ঠ: না, না, ঋষি, আমাকে ছুঁয়ো না তুমি, না, না ছুঁতে নেই।
(দু-তিন বার এই কথা বলতে বলতে কণ্ঠস্বর মিলিয়ে যায়)

.

দ্বিতীয় দৃশ্য

[হাসপাতাল, ক্যাবিনের মধ্যে খাটে ঘুমিয়ে আছে বাবলু, ন-দশ বছর বয়েস। তাকে ঘিরে চার-পাঁচ জন ডাক্তার। সকলের মুখ মেঘলা, ঋষি তার অধ্যাপক এক প্রবীণ ডাক্তারকে শেষবার অনুরোধ করলেন।]

ঋষি: স্যার, নতুন ওষুধ এইমাত্র আমি নিজে দেখে
সব ঝুঁকি নিয়ে, সব ভেবে চিন্তে ভরেছি সিরিঞ্জে
আপনি দিন
স্যার: ঋষি, তুমি ক্ষমা করো, আমাকে বোলো না
বুড়ো হয়ে গেছি, আজকাল হাত কাঁপে
ঋষি: স্যার, কে না জানে আজও কলকাতা কিংবা সারাদেশে
আপনার তুল্য চিকিৎসক বেশি নেই

স্যার: তবু তুমি ক্ষমা করো এই বৃদ্ধটিকে!
যে ওষুধ পরীক্ষিত নয়, তা আমি কী করে জেনেশুনে
দিই?
তোমার সন্তান সে যে আমারও অনেক আদরের
ওকে আমি কী করে অজানা পথে নিয়ে যাব, বলো?
ঋষি: (অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে) ডক্টর লাহিড়ী, আমি
আপনাকে যদি
লাহিড়ী: না, না, ঋষি, ক্ষমা করো
ঋষি: ডক্টর সামন্ত? আপনিও ভয় পেয়ে
সামন্ত: ভয় নয়, ঋষি, এ যে অর্ধেক হত্যার
ঝুঁকি নেওয়া
ঋষি: অর্ধেক জীবন? তার ঝুঁকি নেওয়া যায় না বুঝি?
ঠিক আছেতা। হলে আমিই নিজে পুত্রঘাতী হব,
নিজ হাতে এই বিষ আমি ওর শরীরে মেশাব।
আপনারা সবাই বাইরে যান তবে
[ঘর খালি। ঋষি ছেলেকে ডাকলেন]
ঋষি: বাবলু, বাবলু, ঘুম থেকে উঠে আয়,
আমরা দু'জনে ফের ভোরবেলা বাগানে বেড়াব
বাবলু: বাবা
ঋষি: বাবলু, বাবলু
বাবলু: বাবা, তুমি কত দূরে আছো?
ঋষি: এই তো এখানে আমি, শিয়রের কাছে
বাবলু: ভীষণ যন্ত্রণা! বাবা, তুমি হাত ধরে নিয়ে যাও,
আমাকে অনেক দূরে এমন কোথাও
যেখানে একটুও ব্যথা নেই–

ঋষি: এই দ্যাখ, আমার ডান হাতে ছুরি, আমি
চোখের নিমেষে
তোকে নিয়ে যাব সব যন্ত্রণার শেষে
এক শান্ত অন্য দেশে
বাবলু: খুলতে পারি না চোখ, এত ব্যথা,
কেন এত ব্যথা?
ঋষি: চোখ যে খুলতেই হবে, অন্ধকারে কী করে না দেখে
যাবি সেই অন্য দেশে?
বাবলু: ছুরি কই? এ যে ইঞ্জেকশান!
ঋষি: বাবলু, বাবলু, শোন,
খুব মন দিয়ে তুই শোন,
সিরিঞ্জে ভরেছি আমি নতুন ওষুধ কিংবা বিষ
হয়তো উঠবি বেঁচে, কিংবা চলে যাবি পরপারে
যদি পরপার বলে কিছু থাকে,
সেখানে আমাকে দোষ দিস,
ভেবে নিস, বাবা তোকে সজ্ঞানে স্বেচ্ছায়
পাঠিয়েছে সেইখানে। আর যদি কোনও ক্রমে বেঁচে
উঠিস তা হলে সেটা তোরই নিজের জয়
বাবলু: বাবা, তুমি সব যন্ত্রণার শেষ করে দাও
ঋষি: দেব, তাই দেব, তোর মা আমাকে মাথার দিব্যিতে
নিষেধ করেছে, বুঝি কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে যাবে।
আত্মীয় বন্ধুরা, চিকিৎসক, কেউ রাজি নয়
তুই রাজি? তুই ছেলেবেলা থেকে দারুণ সাহসী
বাবলু: আমি রাজি। আমাকে ওষুধ দাও, কিংবা বিষ
ঋষি: তাই হোক। চোখ চেয়ে থাক

[মৃত্যুর প্রবেশ। মহাভারতের বর্ণনার মতন অনেকটা তার রূপ। সে একটি নারী। সর্বাঙ্গে কালো পোশাক। নতুন তামার বাসনের মতন গাত্রবর্ণ। পিঠের ওপর গুচ্ছ গুচ্ছ আঙুর ফলের মতন কোঁকড়ানো চুল। তার চোখে জল।]

মৃত্যু: একটু দাঁড়াও ঋষি। কথা আছে
ঋষি: কে তুমি?
মৃত্যু: চেয়ে দেখো। খুব কি অচেনা লাগে? বহুবার
দেখা
হয়েছে তোমার সঙ্গে
ঋষি: তুমি সেই? খরা মাঠে বিমানের ছায়ার মতন
চকিতে মিলিয়ে যাও
মৃত্যু: বারবার ফিরে আসি
ঋষি: আমাকে না দেখে বুঝি মন কাঁদে? এমন প্রণয়?
আপাতত বাইরে যাও
মৃত্যু: আমি এই শিশুটির অনন্তকালের ধাত্রী
আমি তমসার মধ্য দিয়ে ওর হাত ধরে
নিয়ে যাব
ঋষি: তুমি এই ছেলেটিকে জননীর কোল থেকে ছিঁড়ে
নিয়ে যেতে চাও
মৃত্যু: আমি এই শিশুটিকে কালের সীমানা ভেঙে শুধু
অসীমে পাঠাব
ঋষি: ওর মা'র স্নেহ, আর আমার বুকের ভালোবাসা
তাও কি অসীম নয়? পৃথিবীর এই মায়াপাশ
যদি ছিন্ন করো বারবার, তবে কেন তা বেছাও?
মৃত্যু: ঋষি, তুমি দেখেছ অনেক মৃত্যু, শুভ ও অশুভ
তবু কেন অস্থিরতা? সব মিথ্যে, আমি শুধু ধ্রুব

ঋষি: তুমি অহংকারী, তবু তোমার দু’চোখে
কেন জল? তোমার কি চক্ষুরোগ?
মৃত্যু: আমার হৃদয় নেই, তবু আমি দুঃখী।
আমি একা।
আমার আকাঙ্ক্ষা নেই, তবু আমি নিত্য ভ্রাম্যমাণা,
অনধিকারিণী আমি, অথচ আমিই হাত পাতি
বাবলু: বাবা, তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ?
ঋষি: কেউ না, বাবলু সোনা! নিছক মনের ভুল,
ছায়া।
বাবলু: বাবা, তুমি সব ব্যথা শেষ করে দাও
ঋষি: এই তো এক্ষুনি দিচ্ছি, দেখি ডান হাত
মৃত্যু: ঋষি, থামো
ঋষি: আঃ, বিরক্ত কোরো না, যাও!
মৃত্যু: ঋষি, তুমি হেরে যাবে
ঋষি: যাই যাব। তবু আমি কোনও দিন না লড়ে
ছাড়িনি
তুমি নয়, মৃত্যু নয়, জীবনের কাছে আমি ঋণী!
তুমি নারী, তুমি সরো, যমরূপী পুরুষ পাঠাও
যার সঙ্গে সরাসরি দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়, তুমি যাও!
মৃত্যু: শোনো ঋষি, কেন এই চঞ্চলতা, এখনও দুমাস
দিতে পারি ওর আয়ু, এখনও রয়েছে ওর শ্বাস
কেন তা থামাবে তুমি? এই পৃথিবীর রূপ রস
আরও কিছুদিন ওর প্রাপ্য, ওর নবীন বয়স
দ্বিগুণ শক্তিতে সব নিতে পারে, ততটুকু নিক
আমি ওকে স্নেহ দিয়ে ঘিরে রাখব জননী অধিক!

ঋষি: কে চায় তোমার কৃপা? আমি আছি প্রাণের প্রহরী।
শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে লড়ে যাই, মুষ্টি মধ্যে ভ্রমরকে ধরি।
এই যে তরল বিষ, এর মধ্যে অর্ধেক জীবন,
অথবা অর্ধেক মৃত্যু, দেখি আমি এর মধ্যে
কোন অর্ধাংশটি জিতে যায়, আমি আছি জীবনের দিকে
—তোমার সন্তান নেই, রাক্ষসিনী, তাই তুমি এই শিশুটিকে
নিয়ে জয়ী হতে চাও?
রাক্ষসিনী, রাক্ষসিনী!
মৃত্যু: ঋষি, শান্ত হও
বাবলু: বাবা, বড় ব্যথা, তুমি ব্যথা শেষ করে দাও
ঋষি: দেব রে, বাবলু সোনা, দেখি ডান হাত
মৃত্যু: ঋষি, শোনো
ঋষি: চুপ!
[ঋষি ইঞ্জেকশানের সুচ ছুরির ভঙ্গিতে ঢুকিয়ে দিলেন বাবলুর হাতে। বাবলু দু' বার বাবা বলে ডেকেই থেমে গেল হঠাৎ। তার গলায় সেতারের তার ছেঁড়ার মতন শেষ শব্দ হল। ঋষি সে দিকে একটুক্ষণ চুপ করে চেয়ে থেকে সিরিঞ্জটা ছুড়ে ফেলে দিলেন।]
মৃত্যু: ঋষি, তুমি হেরে গেলে
ঋষি: (শান্ত ভাবে) জানি। ওর ব্যথা শেষ হয়ে
গেছে
মৃত্যু: আগেই বলেছি হেরে যাবে
ঋষি: খেলতে এসেছি তাই আমি জানি খেলার নিয়ম,
হারজিত আছে। শুধু তুমি আর তোমাদের যম
কখনও হারো না, শুধু জয় নিয়ে দারুণ উল্লাস।
এবার তো সুখী হলে? নিয়ে যাও শিশুটির লাশ।
আমার প্রাণের টুকরো এই শিশু

মৃত্যু: সুখী নই, সুখী নই
যতবার জিতে যাই, ততবার মনে মনে হারি
অনন্ত কালের মধ্যে
আমি এক সুখশূন্য নারী।
এই হাত দুঃখ দিয়ে গড়া, চোখ দুঃখের সমাধি
এসো ঋষি, তুমি আমি দু'জনেই একসঙ্গে কাঁদি।
ঋষি: তোমার চোখের জল, প্রতিটি বিন্দুই মৃত্যু বিষ
তুমি যাও, আমার সন্তানটিকে নিয়ে যাও
কিন্তু আমি হেরে যাইনি, এর পরও প্রতি অহর্নিশ
লড়ে যাবে
আমার বাবলুর মতো আরও শত সহস্রকে নিশ্চিত বাঁচাব
কখনও তোমার সঙ্গে আমার লড়াই থামবে না
মৃত্যু: তোমার প্রতিদ্বন্দিনী নই আমি, আমি আসি কালের
নিয়মে সমস্ত সংগীত এসে থামে এক সমে
গাছের পাতারা ঝরে যায়
সকালের ফুলগুলি সন্ধেবেলা সুষমা হারায়
ঋষি: এই সব ছেঁদো কথা, বস্তা পচা সান্ত্বনার ভাষা
শুনলে মাথায় রক্ত জ্বলে ওঠে, যাও, যাও
নাকি আমাকেও সঙ্গে নিতে চাও?
দেব গলা টিপে?
মৃত্যু: ছুঁয়ো না, আমাকে ছুঁতে নেই
বিশুদ্ধ কুমারী আমি, কোনও জীবিতের স্পর্শ
এই ভাগ্যে নেই
আমার একমাত্র সুখ পরাজয়ে
[হঠাৎ যেন বাবলু ঘুম থেকে জেগে উঠে বাবা, বাবা বলে ডাকে]

ঋষি: বাবলু, বাবলু, তুই ফিরে এসেছিস?
বাবলু: বাবা, সব ব্যথা সেরে গেছে।
ঋষি: আঃ আঃ, এ কী স্বপ্ন, নাকি সত্যি?
ঋষি, তুমি বীর যোদ্ধা, হাতে তলোয়ার
গর্ব দৃপ্ত মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ, এই দৃশ্যে
কী যে সুখ, কত সুখ হল যে আমার...
ঋষি: অর্ধেক মৃত্যুর ঝুঁকি, অর্ধেক জীবন
আমি জীবনের দিকে, আমি জেদি জীবনের দিকে!

.

এর পর ঋষি ও মৃত্যু দু'জনে বাবলুর দুপাশে হাঁটু গেড়ে বসে। দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

[এই কাব্যনাটকটি কেউ অভিনয় করতে চাইলে আগে লেখকের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। অভিনয়ের সময় লাইনগুলি কবিতার মতন নয়, গদ্যের মতন স্বাভাবিক ভাবে উচ্চারণ করা যেতে পারে।]

মালঞ্চমালা – কাব্যনাটক

এক দেশে এক রাজা ছিলেন।

রাজার ভাণ্ডার ভরা মণি-মাণিক্য, হাতিশালে কত হাতি, ঘোড়াশালে কত ঘোড়া, রাজ্যে নেই চুরি-ডাকাতি, তবু রাজার মনে বড় দুঃখ। তাঁর কোনো সন্তান নেই।

কত সাধু-সন্ন্যাসী, কত যোগী আর জ্যোতিষীর কাছে পরামর্শ নিলেন রাজা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। শেষ পর্যন্ত রাজা ঠিক করলেন, রাজ্যপাট ছেড়ে রানীকে নিয়ে বনে চলে যাবেন। রানীও মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে রাজি হয়ে গেলেন। সব ঠিক ঠাক। সেই রাত্রে রাজা আর রানী সোনার পালঙ্কে পাশাপাশি শুয়ে আছেন, চক্ষের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। শেষ রাতে যেই একটু ঘুম এসেছে অমনি স্বপ্নের মধ্যে দু'জনেই শুনতে পেলেন দৈববাণী:

(কালপুরুষের গান)

শোনো শোনো মহারাজ, শোনো মহারান
এখনি যেওনা ছেড়ে এই রাজধানী
ভাবেন দেখি মনে মনে কী করেছ পাপ
পাপের খণ্ডন হলে যাবে অভিশাপ
কারে বা দিয়েছ দুখ কারে দিলে ছাই
কারাগারে কারা আছে, ভেবে দ্যাখো তাই
হাতে বেড়ি পায়ে বেড়ি তবু করে গান
কে আছে এমন তার করহ সন্ধান।

যেই না গান শেষ হল, অমনি রাজা জেগে উঠে বললেন, কী শুনলাম, কী শুনলাম। রানী, ওঠো ওঠো।

রানীও সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠে বললেন, কী শুনলাম, কী শুনলাম। রাজা, আপনি কী পাপ করেছেন?

রাজা: রানী তুমি কী পাপ করেছ?

রানী: কিছু তো পাপ করিনি আমি কিছু তো পাপ করিনি। এমনকী এই জীবনে একটা পিঁপড়ে অবধি মারিনি। না, না, ভুল বলেছি, একবার একটা পিঁপড়েকে জলে ছেড়ে দিয়েছিলুম।

রাজা: ছি, ছি, ছি, রানী, তুমি একটা পিঁপড়েকে জলে ছেড়ে দিয়েছিলে? খুব অন্যায়, ভারী অন্যায়! আজ থেকে এই রাজ্যে আর কেউ পিঁপড়ে মারবে না।

রানী: মহারাজ, আপনি কোনো পাপ করেননি?

রাজা: উহুঃ!

যদিও আমি লোক মেরেছি বহু
কিন্তু সে তো যুদ্ধ
যুদ্ধে তুমি যা করো তা সমস্তটাই শুদ্ধ।
তবে
সত্যি কথা আজ বলতেই হবে
দোষ করেছি একটা
কালো হাঁড়িতে ঘষে দিয়েছি হুলো বেড়ালের নাকটা।

রানী: ছি, ছি, ছি, রাজা, আপনি বেড়ালের নাক ঘষে দিয়েছেন? সে যে অন্যায়, ভারী অন্যায়। আজ থেকে বেড়ালের নাক ঘষা নিষিদ্ধ।

রাজা: রানী, তুমি আর কী দোষ করেছ?

রানী: মহারাজ, আর তো কিছু না। আপনি আর কী দোষ করেছেন?

রাজা: আর কিছু না। আর কিছু না।

রাজা চেঁচিয়ে ডাকলেন, মন্ত্রী। মন্ত্রী।

মন্ত্রী তক্ষুনি হাজির।

মন্ত্রী: দণ্ডবৎ হই মহারাজ। এত রাতে ডেকেছেন, আজ আমার কী সৌভাগ্য।

রাজা: মন্ত্রী, কহ দেখি মন খুলে
কখনো মনের ভুলে
আমি কি করেছি কোনো পাপ?
মন্ত্রী: এ কী কথা শুনি আজ
পাপ করবেন মহারাজ
এ যে কানে শোনাও মহাপাপ অতি
সে জন্য তো আমরা আছি তৈয়ার
আদেশ পেলেই মাথা কাটি যার তার
মহারাজ তো সবাকার অগতির গতি।
রাজা: বলো দেখি সত্য করে।
কারাগারে আছে ক'জনা?
মন্ত্রী: কেহ নাই মহারাজ
প্রজারা সবাই করে আপনার ভজনা।
রাজা: হাতে পায়ে বেড়ি তবু কে বা করে গান?
মন্ত্রী (চিন্তিত) বন্দিদশায় গায় গান কার এমন শখের প্রাণ?
ওঃ হে মহারাজ, মনে পড়েছে। এ সেই কোটাল ব্যাটা।
সাত বছর আগে তাকে আপনি কারাগারে পাঠালেন দিয়ে
হ্যাটা।
রাজা: নগর রেখে শুনশান।
কোটাল কেন গায় গান।
বাড়ি তাহার নদীর ধারে
যাবে কেন সে কারাগারে?
মন্ত্রী: ভুলেই গেছেন মহারাজ
কোটাল অতি জাহাবাজ
জলের ওপর দিয়ে হাঁটে

মুখের ওপর কথা কাটে।
সেই জন্য আপনি একদিন রাগ করে
তাকে ভরে দিলেন জেলখানায়।
রাজা: তাই নাকি, চলো তো দেখে আসি কোটালকে।
.
(কোটালের গান)
লোহা ঝনঝন বেড়ি ঝন ঝন
শীতে কনকন খিদে চনচন
মাছি ভনভন ব্যথা টনটন
গলা খনখন মাথা বনবন
হাওয়া শনশন রোদ গনগন
বাজে ঠনঠন কাজে ঢনঢন
হটে হনহন...
দূর ছাই আর মনে পড়ছে না।
মন্ত্রী: ও কোটাল, কে এসেছেন, দ্যাখো মেলে চোখ/
কোটাল: ওরে বাবা, এ যে মহারাজ, জয় হোক জয় হোক।
এ যেন রাতের বেলা সূর্য, আমার জীবন ধন্য।
আদেশ করুন প্রভু এবার কী শাস্তি দেবেন অন্য!
রাজা: আজ থেকে তুমি মুক্ত হলে
আমি জ্বলেছি অনেক অনুতাপ অনলে।
যাও, বাড়ি চলে যাও
খাও দাও, প্রাণের আনন্দে গান গাও।
তবে একটি অনুরোধ শোনো
মুখের ওপরে কথা আর যেন বোলো না কখনো
কোটাল: কক্ষনো না কক্ষনো না

আজ থেকে আর পায়ের ওপরেও কথা কবো না।

.

কথক: পরদিন রাতে আবার রাজা আর রানী
একই স্বপ্নে শুনলেন দৈববাণী।
(কালপুরুষের গান)
শোনো শোনো মহারানী, শোনো মহারাজ
কেমনে লভিবে পুত্র তা বলিব আজ
তিন দিন তিন রাত্রি থাকো উপবাসে
চতুর্থ প্রভাতে যেও মালঞ্চের পাশে
মালঞ্চে যুগল আম সোনার বরণ
সেই দুটি ফলে রাজা করিও পারণ।
পাকা ফল রানী খাবে, কাঁচা ফল রাজা
ভুল যদি করো তবে, পাবে ফের সাজা।
কথক: শুনে সেই দৈববাণী
আনন্দে আটখানা হলেন রাজা আর রানী।
উপবাসে কেটে গেল তিনটি দিন রাত
অবশেষে এল সেই আনন্দ প্রভাত।
ব্যাকুল হৃদয়ে রাজা ছুটলেন মালঞ্চের পানে।
সঙ্গে এল পাত্র মিত্র যে ছিল যেখানে।
সেই মালঞ্চে কচি পাতার নীচে এক বোঁটায় দুটি আম
ফলে আছে। একটি পাকা সোনার বরণ, অন্যটি কাঁ...
রাজা ছুড়লেন তির
চতুর্দিকে সে কি ভিড়
তবু আম তো পড়ে না।
একটি নয় দুটি নয়

তির ছুড়লেন শয়ে শয়
তবু আম তো পড়ে না।
রাজা হুকুম দিলেন: যে পারো আম পাড়ো। তবে এক বোঁটায় একসঙ্গে দুটি
থাকা চাই। নইলে রক্ষা নাই।
কথক: পাত্র মিত্র মন্ত্রী সেনাপতিরা অতি উৎসাহে আম পাড়তে গেলেন। কারুর ধনুকের ছিলা ছিঁড়ে গেল, কেউ গাছে উঠতে গিয়ে হাত পা ভাঙল, তবু আম পড়ে না। ভিড়ের এক কোণে লুকিয়ে ছিল সেই রোগা লিকলিকে কোটাল। সে এবারে সামনে এসে বলল,
কোটাল: যদি অনুমতি পাই,
আম দুটিরে নীচে নামাই।
পাত্রমিত্ররা সবাই হে হে করে হেসে উঠল। একজন বলল,
হাতি ঘোড়া গেল তল
ফড়িং বলে কত জল
কত এল জ্ঞানী গুণী
এল এবার হাত-বাঁধুনী।
রাজা বললেন: দেখো কোটাল।
না পারো তো শূল, পারো তো শাল।
কোটাল: মারি তো গণ্ডার
লুটি তো ভাণ্ডার
কাদায় পড়লে হাতি
ব্যাঙেও মারে লাথি।
কথক: মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে ছোট্ট একটি পাথর
কোটাল এমন মন্ত্র পড়ে সবাই ভয়ে কাতর
কোটালের মন্ত্র: ক্রিং ঘ্রিং হ্রি ত্রিং
ছক্কা না ফক্কা
কথাটি কেউ কইলেই

অমনি পাবে অক্কা।
কোটাল ঢিল ছুড়তেই ঝুপ করে আম দুটি পড়ল রাজার পায়ের কাছে। সবার মাথা হেঁট। রাজা গা থেকে নিজের শালখানা যেই কোটালকে দিতে গেলেন, অমনি মন্ত্রী বললেন, মহারাজ, কোটালের শেষ কথাটার অর্থ কী?
রাজা বললেন: তাই তো, তাই তো, কী যেন বলেছে। কোটাল বলো তো আবার।
কোটাল: কাদায় পড়লে হাতি
ব্যাঙেও মারে লাথি
রাজা: অ্যাঁ? ফের আমার মুখে মুখে কথা কও?
মন্ত্রী এই দুর্বিনীত কোটালকে জেলখানায় ভরে দাও।
তারপর রাজা একাই ঘোড়া ছুটিয়ে চললেন রাজপুরীর দিকে। যেতে যেতেহাতের আম দুটি একবার দেখেন, একবার রাখেন। একবার দেখেন, একবার রাখেন। দেখে দেখে আর আশ মেটে না। শেষ পর্যন্ত রাজা আর লোভ সামলাতে পারলেন না, টপ করে খেয়ে ফেললেন একটি আম। মনের ভুলে রাজা খেলেন পাকা আমটি আর কাঁচাটি দিলেন রানীকে।
রাজার ঘোড়ার শব্দ শুনেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন রানী। রাজা বললেন, রানী, রানী, এই দেখো এনেছি সেই পরমাশ্চর্য ফল!

.
কথক: দশ মাস দশ দিন পরে
জন্ম নিল রাজার ঘরে
অপরূপ সুরূপ রাজকুমার।
শত চাঁদ হার মেনে যায়
সারা অঙ্গে অমৃত গড়ায়
এমনটি দেখেনি কেউ আর।
রাজ্য জুড়ে ধুমধাম, নাচ গান অবিরাম, কত ফুর্তি কত মজা, দান ধ্যান করলেন রাজা, রানী দিলেন ষোড়শ উপাচার, প্রজাদের আনন্দ অপার।

তার পর এল ছয় ষষ্ঠীর রাত।
কথক: আঁতুড় ঘর আলো করে আছেন রাজকুমার
সেপাই মন্ত্রী পাহারা দেয় ঘিরে চারি ধার
আসবেন আজ কালপুরুষ দেবেন তিনি ললাটের লিখন
একবার যা লেখা হবে আর তা না হবে খণ্ডন
ফুলের মালা, সোনার ঝালর, জ্বলে ঘিয়ের বাতি
মা মাসি আর দাস-দাসীরা জেগে পোহাবেন রাতি।
(মহিলাদের কথাবার্তা)
রাত হল নিঝুম
সবার চোখে ভেসে এল সহসা কাল ঘুম।
(সেপাই শান্ত্রীদের নাক ডাকার আওয়াজ)
তিনটি প্রহর পেরিয়ে গেল, এল কালপুরুষ
দেখল না কেউ তারে সেথায় কারুর নেই হুস।
কালপুরুষ: সোনার বরণ রাজকুমার হীরের টুকরো মন
হাতে পতাকা, পায়ে পদ্ম অতি সুলক্ষণ
যা দেবার তা সবই আছে নতুন কি লিখি?
(হঠাৎ কালপুরুষ চমকিয়ে)
এ কি।।
না, না, না, না, হায় হায় আমি এক্ষুনি চলে যাই
যা দেখলাম তারপর আর লেখার কিছু নাই।
সেই ঘরের দ্বারের কাছে শুয়ে ছিল মালিনী মাসি। কালপুরুষ তাকে ডিঙিয়ে যেতেই পায়ের ছোঁয়া লেগে গেল। অমনি জেগে উঠে সে পা চেপে ধরল কালপুরুষের।
মালিনী: রাজার দুলাল নয়নমণি ঘুমে আছে সে।
দুয়ারে গোয় মালিনী মাসি তারে ডিঙায় কে?
কে তুমি কও সত্য করে দস্যু কি দানব

কি বা অভিসন্ধি তব, দেব কি মানব?
কালপুরুষ: ওরে মালিনী, পা ছাড়, আমি কালপুরুষ
মালিনী: রাজার দুলাল, নয়নমণি, রাঙা চাঁদের কণা
কী লিখিলে না কহিলে পা ছাড়ব না
কালপুরুষ: ওরে ছাড় ছাড়
মালিনী: কী লিখিলে না কহিলে ছাড়বই না আর
কালপুরুষ: নাছোড়বান্দা, জানাই শুধু তোরে
দ্বাদশ দিন পরেই কুমার যাবে যমের দোরে
ফল করেছে অদল বদল
পাকা ফলটি নিজে খেয়েছে রাজা
সেই ভুলে তার এমন হল সাজা।
নিজের দোষে সুখের আশা করল রাজা ছারখার
মালিনী তুই আমার পা ছাড়।
মালিনী: বারো দিন? হায় হায় হায় হায়
সকলে জেগে উঠে কী হল কী হল বলতে লাগলেন। তারপর একটা কান্নার রোল পড়ে গেল। রানী মূর্ছা গেলেন।
রাজা: করেছি ভুল, করেছি পাপ
শাস্তি নেব তার
চাই না এই রাজ্যপাট চাই না কিছু
আর কত আশায় পূর্ণ চাদ
এনেছিলাম ঘরে
রাহুতে গ্রাস করবে তারে
বারো দিনের পরে।
হায় নিয়তি এমন ক্ষুধা
শিশুরে নেবে কেড়ে

দেখব না সেই দৃশ্য আমি
পৃথিবী যাব ছেড়ে।
কথক: মালঞ্চের পাশে রাজা ভূমিতে শয়ান
যদি না কুমার বাঁচে ত্যজিবেন প্রাণ
পাত্র মিত্র সবাই কাঁদে কেহ নাই বাকি
রাজার দুঃখে কেঁদে ওঠে বনের পশু পাখি
তাই দেখে কালপুরুষের দয়া হল মনে
ব্রাহ্মণের বেশে তিনি এলেন সেই বনে।
রাজা: কে আপনি দিব্য কান্তি জ্যোতির্ময় প্রভু?
মোর রাজ্যে আপনারে দেখি নাই কভু।
কালপুরুষ: আমি অত সাধারণ ব্রাহ্মণ
যেথা সেথা ঘুরি ফিরি যখন যেদিকে চায় প্রাণ মন।
রাজা: গ্রহ তারা আছে যেন তব দেহে মিশি
অন্ধকার দূর হল এল শুক্লা নিশি
সহসা পেলাম দেখা কোন পুণ্যবলে
নিরাশায় আশা যেন শান্তি শোকানলে
ধন রত্ন সব দেব, যত খুশি চান
আঁতুড়ে কুমার মরে, তাহারে বাঁচান!
কালপুরুষ: পূর্ণচাঁদ রাহুতে খায়, সূর্যে গ্রহণ হয়
বিধাতার বিধান রাজা, মিথ্যে হবার নয়
রাজা: তা হলে দেখুন প্রভু, এই তলোয়ার
এখনি বসাব বুকে নিজ প্রাণ রাখিব না আর
কালপুরুষ: আরে আরে, করো কি করো কি
উপায় আছে কি কিছু দেখি
যদি পাও সুলক্ষণা কন্যা এক দ্বাদশ বর্ষীয়া

রাজকুমারের সাথে দাও তার বিয়া
আঁতুড়ে বিবাহ হলে পুত্র রক্ষা পাবে
বধূ এসে সেবা যত্নে স্বামীরে বাঁচাবে।
.
কথক: যাবার আগে কালপুরুষ নিলেন একটি হীরে
আকাশ পথে যেতে যেতে সেই হীরেটি ছুড়ে দিলেন
নদীর অন্য তীরে।
(ঢাক ঢোলের শব্দ)
কথক: মহানন্দে রাজা ফিরলেন নগরে
ধ্বনি উঠল ঢাক-ঢোল-কারা-নগরে
চতুর্দিকে ছুটল রাজার চর
বারো বছরের কন্যা আছে কাহার ঘর
সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে কত রাজ্যে
দূতেরা সব ঘুরে বেড়ায় এই জরুরি কার্যে
কিন্তু হায়, কোথাও নেই বারো বছরের কন্যা
যাঁদের ঘরে আছে তারাও বিবাহ দিতে চান না
বারো বছরের মেয়ের সাথে আঁতুড় ঘরের ছেলের হবে বিয়ে
যারাই শোনে, তারাই হাসে ঠোঁট মুখ বেঁকিয়ে!
তা হলে কী উপায়?
রাজা-রানী-পাত্র মিত্র সবাই করেন হায় হায়
এদিকে দিন যায়
রাজকুমারের আয়ু মোটে আর একটি মাত্র দিন
স্বাসপ্রশ্বাস হয়ে এসেছে ক্ষীণ
(মালঞ্চমালার গান)
মালঞ্চমালা: আকাশ থেকে খসে পড়ল হীরে

বিকেলবেলা বিজন নদীর তীরে
ও চাপা গাছ, ও শেফালি, বলতো তোরা বল
এই হীরেটি কোন্ দেবতার এক বিন্দু চোখের জল?
কথক: শুনে সেই গান
সহসা আকুল হল রাজার পরাণ
নদী তীরে যান ছুটে উথাল পাথাল
আশার তরঙ্গ হয় হৃদয়ে উত্তাল
সেখানে–
খাটের পৈঠায় আছে বসি
সোনার প্রতিমা এক যেন স্বর্ণশশী
পায়ের নূপুরে তার ভ্রমর গুঞ্জন
গান শুনে মনে হয় কোকিল কুজন।
তখন–
রাজা: ওকে? ওকে? মন্ত্রী, বলো, ওকে?
দেবী না মানবী, নাকি ভ্রম দেখি চোখে?
মন্ত্রী: মহারাজ
মনে হয় এল বড় শুভদিন আজ
ওই সুলক্ষণা কন্যা, কোটালের বালা
দ্বাদশবর্ষীয়া মাত্র রূপ-গুণের ডালা!
রাজা: অ্যাঁ? সেই কোটালের কন্যা?
না, না, না, চাই না ওকে চাই না
মন্ত্রী: মহারাজ, সময় তো আর নেই মোটে
মন ঠিক করে নিন নিদারুণ এমন সংকটে
রাজা: তবে যাও
কোটালকে কারাগার হতে দ্রুত মুক্ত করে দাও

কী করি যে নিরুপায়, নিয়তিকে ধিক
ফাজিল কোটাল হবে মম বৈবাহিক!
মন্ত্রী: (কারাগারে এসে) কোটাল ভায়া কোটাল ভায়া,
বেঁচে আছ কি
এবার তোমার জন্য জবর খবর এনেছি
কোটাল: বেদেয় চেনে সাপের হাঁচি
জেল খানাতে বেশ তো আছি
আসল কথাটি বলো তো খুলে
এবার বুঝি চাপাবে শূলে?
মন্ত্রী: সময় নাই তাই সংক্ষেপে জানাই
রাজার ছেলে হবে তোমার জামাই
হাত পায়ের বেড়ি খুললাম, শীঘ্র বাড়ি যাও
আঁতুড় ঘরে বাসর হবে, কন্যারে সাজাও!
কোটাল: হে হে হে হে হে!
শোনো শোনো পাড়া পড়শি কে কোথায় আছ কে হে!
মন্ত্র পড়ে ঢিল ছুড়লাম ফল পাড়লাম আমি
তাই আজ কন্যার আমার রাজপুত্র স্বামী
রাজার বেহাই হতে চল্লাম, নজর-খাজনা দে
হে হে হে হে হে হে!
কোটালনী, দ্বার খোল, ও কোটালনী
তোমার কন্যা হবে যে আজ রাজবাড়ির ঘরনী
কোটালনী: না, না, না, না
দেব না আমি কন্যা
স্বামী রইলেন কারাগারে আমরা কুঁড়ে ঘরে
কেউ খবরও নিত না এক নজরে

ছেলের আয়ু বারো দিন মোটে।
দেব না কন্যা যদি ভাতও না জোটে!
মালঞ্চমালা: মাগো তুমি বারণ কোরো না, আমি যেতে চাই।
আমার কারণে যদি কেহ পায় প্রাণ, তার চেয়ে বড় কিছু নাই!
কোটালনী: দুখিনীর ধন তুই, ওরে তোরে কী করে ছাড়ি
যমের দুয়ার ও যে, নয় রাজবাড়ি!
মালঞ্চমালা: কী করেছি পাপ যমেরে শুধাব আমি
কেন হরিবেন আমার জীবন স্বামী;
বাবা তুমি যাও, রাজারে শুধাও আগে
দাবি আছে কিছু যদি তার মনে লাগে
বাসর শয়নে আমি যাব চলে আজই।
তিনটি শর্তে যদি তিনি হন রাজি
কোটাল: কী কী তিনটি শর্ত আছে বলতে শুনি মা তোর
আঙুল তুলে নাচাই যদি তাও নাচবেন রাজা এমন কাতর
মালঞ্চমালা: হোক না রাজার কুমার তবু আমার স্বামী কোটাল ঘরের জামাই
বিয়ের পরে একটি দিন এই কুটিরে আসা চাই।
আমার হাতের রাঁধা অন্ন রাজা রানী খেতে চাইবেন কিনা
বাসর ঘরে যা চাইব মেনে নেবেন কোনো প্রশ্ন বিনা
কোটাল: ঠিক ঠিক বলেছিস, তিনটি কথাই অতি ন্যায্য
না যদি মানেন রাজা উৎসন্নে যাবে তার রাজ্য
(রাজসভায় কোটাল)
কোটাল: মহারাজঃ
রাজার রাজা মোহন রাজা
এক বংশী হাজা এক বংশী বাজা
আজ হলেও বেহাই কাল হলেও বেহাই

শর্তে আছে তিন তিনটি নইলে কোনো কথা নাই
প্রথম শর্তটি হল...
রাজা: কী এতবড় বেল্লিক নচ্ছার
শর্ত শোনাতে চায় আমাকে;
হবে রাজার বেহাই শুনে মাথা ঠিক নাই
কে কোথায় আছিস রে বাঁধ একে;
মন্ত্রী, কোটালকে ছুড়ে ফেলো গর্তে
মরুক সে বে-আদপি শর্তে
শূন্যে উড়িয়ে আনো মেয়েটিকে ওর
এখনি বিবাহ হবে না ফুরাতে এই নিশি ভোর
কথক: না হল গায় হলুদ, না বাজল সানাই
কেমন এ বিবাহ কন্যাপক্ষ নাই
নেই ফুল মালা আতর গন্ধ
নিঝুম রাজপুরী অতি নিরানন্দ
পুরুত মন্ত্র পড়ে ওম নমো নমো
বর শুয়ে কাঁদে ওঙা, ওঙা, ওঙা
ঘুরল সাত পাক শিশু স্বামী বক্ষে
নতুন বধুটির জল নেই চক্ষে
এসে বাসরঘরে যেই খিল দিল
প্রলয়ের ঝঞ্ঝা এসে আকাশ ছাইল
সে কি মেঘ বৃষ্টি আগুন লেলিহান
প্রাসাদ-কুটির ভেঙে খান খান
ওঠে চতুর্দিকে দারুণ হাহাকার
সৃষ্টি বুঝি যায় সব ছারখার
মূর্ছা যান রানী দৌড়ে আসেন রাজা

সভয়ে ব্যাকুল যত ছিল প্রজা
বধূ না এ ডাইনি খেল বুঝি সব
এদিকে রাজপুত্র নিথর নীরব।
রাজা বাসরঘরে এসে দেখলেন মরা স্বামী কোলে নিয়ে চুপ করে বসে আছেন মালঞ্চমালা!
রাজা: ডাইনি ডাইনি,
দূর হয়ে যা সর্বনাশিনী!
মালঞ্চমালা: শর্ত মেনেছেন মহারাজ
বাসরঘরেতে আমি যা চাইব সকলি দেবেন আজ
আমি শুধু এইটুকু চাই
স্বামীকে বুকে নিয়ে বাড়ি চলে যাই!
রাজা: কী, এমন সাহস রাক্ষসীর
এখনও যে উচ্চে তোলা শির!
আমার পুত্রের প্রাণ খেয়েছিস
রাজপুরী, দেউল, প্রাকার ভেঙেছিস
আর তোর নাহিক নিস্তার
ওরে কে আছিস, জ্বলন্ত চিতায় এই ডাইনিকে
এখনই পুড়িয়ে তোরা মার।
.
০২.
বজ্রের গর্জন আর প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি। একদল লোকের কোলাহল।
কথক: এত ঝড় এত বৃষ্টি। তবু জ্বলে চিতা
জীবন্ত পুড়িবে আজ কোটালদুহিতা
(আবার প্রচণ্ড শব্দ)
কথক: গুরু গুরু ওঠে রব, মাটি কেঁপে ওঠে

হুড়মুড় গাছ পড়ে, নদী জল ছোটে
শুরু হল ভূমিকম্প কে কোথা পালায়
তখন মালঞ্চমালা চিতা ছেড়ে যায়
প্রাণপণে দিল দৌড় ঘন অন্ধকারে
পছিল শেষে এক বনের মাঝারে
বিরাট এক বন সেইখানে স্বামী কোলে নিয়ে বসে রইল মালঞ্চমালা।
(ভূতপ্রেতদের শব্দ)
এক পেত্নি: চাকুম চাকুম চাকুম লো
মানুষের গন্ধ পাইলো।
এক ভূত: ঐ যে দেখি একটা খুকি
বাচ্চা-কোলে কাঁদে
পেত্নি: চাকুম চাকুম চাকুম চাকুম
পড়েছে বেশ ফাঁদে
ওরে কে তুই ওরে কে তুই
মালঞ্চমালা: ছিলাম কোটাল কন্যা মালঞ্চমালা আমি
কপালের লিখনে পেলাম রাজপুত্র স্বামী
ভূত: রাজপুতুরের মাংস, আহা, তার তুলনা নাই
পেত্নি: দে দে দে, আগে খোকাটারে খাই!
মালঞ্চমালা: যদি বা কিছু পুণ্য করে থাকি
না করে থাকি পাপ
তা হলে কেউ ছুঁয়ো না এসে আমাকে
দেব যে অভিশাপ
ভূত ও পেত্নি: ওরে বাপরে!
এ যে অভিশাপের ভয় দেখায়
পেত্নি: ও মালঞ্চমালা, তোর পতি ঘুমে না যমে?

মালঞ্চ: ঘুমে!
ভূত: বলে কি! চোখ উলটে পড়ে আছে ও খোকা তো আমাদের!
পেত্নি: ও মালঞ্চ, ভালো করে দ্যাখ,
তোর পতি ঘুমে না যমে!
মালঞ্চ: ঘুমে!
ভূত: বলে কি! দে দে আগে ওর হাড় মাংস খাই
তারপর ওকে খোকা ভূত বানাই!
পেত্নি: আমাদের একটাও ছানা নাই!
(দূরে দু'জন পুরুষের গলার শব্দ)
পেত্নি: মালঞ্চ লো, বসে আছিস না?
মালঞ্চ: হ্যাঁ
পেত্নি: পতি দিয়ে কী করবি মরা পতিটা দে না
মালঞ্চ: না
.
কথক: গন্ধ পেয়ে আসে ধেয়ে আরও কত ভূত
তারই মধ্যে এল ছুটে দুই যমদূত
১নং যমদূত: হঠো হঠো সব তফাত যাও
আমাদের জিনিস আমাদের নিতে দাও
(ভূতেরা গোলমাল করতে করতে পিছিয়ে যায়)
মালঞ্চ: কে তোমরা?
২য় যমদূত: আমরা কালদূত আর শালদূত
১নং যমদূত: মালঞ্চ, যমের আজ্ঞা, স্বামী ছাড়ো
মালঞ্চ: নাও দেখি কেড়ে কী করে পারো!
যদি বা কিছু পুণ্য করে থাকি
না করে থাকি পাপ

তা হলে কেউ ছুঁয়ো না এসে আমাকে
দেব যে অভিশাপ!
১নং যমদূত: হে হে হে হে হে হে
অভিশাপের ভয় দেখায় এই মেয়েটা কে হে?
দে মরা স্বামী দে!
মালঞ্চ: পাই নাকো ভয় তোমাদের এই ধমকে
ডেকে নিয়ে এসো তোমাদের রাজা যমকে
২য় যমদূত: ওরে দাদা,
আমরা ছাপোষা প্রাণী নিতান্তই যমের ।
অভিশাপ দিয়ে বসে, এসব ঝঞ্ঝাটে নেই কাজ
সদরে জানাই গিয়ে সব, যা বোঝার বুঝবেন যমরাজ!
.
(তারপর শন শন করে বাতাস বইতে থাকে, গাছপালা নিচু হয়ে আসে। ফিস ফিস করে শব্দ শোনা যায়: ও মালঞ্চ, মালঞ্চ লো, মরা পতিকে ছাড়, দ্যাখনা পচে উঠেছে, ফুলে উঠেছে, দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে, ওকে ছুড়ে ফেলে দে, তোকে সোনা দেব, হীরে দেব, ভালো ভালো জামাকাপড় পাবি, আহার বিহার সুখ পাবি)
মালঞ্চ: না, না, না!
দূরে নূপুরের ঝুমঝুম শব্দ। ক্রমে শব্দ কাছে এগিয়ে এল। খুব মিষ্টি গলায় একটা মেয়ে কথা বলে উঠল:
মেয়েটি: কে এখানে, মালঞ্চ নাকি লা? তাই বলি
তোতে আমাতে ছোট বেলা থেকে কত গলাগলি
তা বোন, ওটা কি দেখছি পড়ে আছে তোর কোলের কাছে
ওমা ও যে বাসি মড়া! ফেলে দে ফেলে দে, ও নিয়ে কি খেলতে
আছে?
মালঞ্চ: কে রে এল গত জনমের বোন, আগে তো কখনো দেখিনি

পতিকে ছাড়তে বলিস রে তুই কোন প্রেতিনী বা ডাকিনী?
দূর হয়ে যা! দূর হয়ে যা!
মেয়েটি: আহা, তোর পতি; মাগো তা বুঝিনি,
রাগ করিস নি বোন
যদি ভালো চাস তা হলে যা বলি মন দিয়ে আগে শোন
পতিরে আমার কোলে দিয়ে তুই চলে যা নদীর ওপারে
ওষুধ গাছের পাতা নিয়ে আয় তাতে সব রোগ সারে।
মালঞ্চ: তোরে দেব পতি? খেতে চাস বুঝি? কে তুই সর্বনাশিনী
যত অসহায় হই তবু আমি অকূল পাথারে ভাসিনি।
দেব অভিশাপ পুড়ে হবি ছাই
মেয়েটি: না না, অত রাগ করিস নি ভাই
মালঞ্চ: সাক্ষী থেকো চন্দ্র তারা সাক্ষী থেকো অন্ধকার রাতি
পতি যদি না বাঁচে তো নিশি শেষে হব আত্মঘাতী
মেয়েটি: ও মালঞ্চমালা, চেয়ে দ্যাখ
ভোরের বাতাস এল
দুঃখ নিশি ঘুচে গেল
আর তোর কোনো নেই ভয়
মালঞ্চ: ওমা, একে?
হস্তে গলে ফুল মালা
কে গো তুমি বনবালা
দেখে খুব চেনা মনে হয়
কুকথা বলেছি কত
মাথা ঠিক ছিল না তো
ক্ষমা করো আমায় ভগিনী
বনদেবী: সকলি বুঝেছি আমি মোটেই রাগি নি

তুমি যে মালঞ্চমালা বনদেবী আমি
দ্যাখো দ্যাখো চেয়ে দ্যাখো জাগে তব স্বামী।
(বাচ্চার খিলখিল হাসি)
মালঞ্চমালা: ওমা ওমা এযে সত্যি, এযে সত্যি!
বনদেবী: যা বোন, এবার ঘরে ফিরে যা
আহা কি সুন্দর তোর পতি, আমি ওরে নাম দিলাম
চন্দ্রমানিক!
.
কথক: বাতাস বইছে মন্দ মন্দ
তাতে যেন চন্দনের গন্ধ
মিঠে রোদ্দুর সোনার চাদর
গায়ে লাগে যেন মায়ের আদর
ফুলের বাহারে চোখ যায় ভরি
পাখির কুজনে সুরের লহরী
মালঞ্চমালা যায় বনপথে
মন যেন তার স্বর্গ জগতে
চন্দ্রমানিক কোলে শুয়ে হাসে
কত প্রজাপতি ঘোরে চার পাশে
(বাচ্চার খিলখিল হাসি)
কিন্তু মালঞ্চমালা পথ ভুল করল। নিজের রাজ্যে না ফিরে সে আরও গভীর জঙ্গলে চলে গেল। আবার রাত্রি এল।
মালঞ্চ: এ কোন অচেনা দেশ, গহন কান্তার
সর্ব অঙ্গ বড় ব্যথা শক্তি নেই আর
(শিশুর কান্না)
মালঞ্চ: কোথা বনদেবী, সই বলে দাও তুমি

কেমনে যে পার হব এই বনভূমি
(শিশুর কান্না)
মালঞ্চ: রাজপুত্র স্বামী মোর সোনার থালায়
কোথায় খাওয়াব তারে, আমি অভাগিনী
এখন কাঁদেন তিনি ক্ষুধার জ্বালায়
বনবালা, বনবালা, কোথায় ভগিনী!
(দূরে বাঘের গর্জন)
মালঞ্চ: কে কোথায় আছ সব দেবদেবীগণ
দিতে পারি নিজের জীবন
যদি এক ফোঁটা দুধ পাই
কোনোক্রমে পতিরে বাঁচাই।
বাঘ: হালুম! হালুম!
কাছাকাছি মানুষের গন্ধ পেলুম!
বাঘিনী: হালুম! হালুম!
এই তো গাছের তলায় দেখলুম
ফুটফুটে এক মেয়ের সাথে ছোট্ট একটি বাচ্চা
শিকার অতি সাচ্চা।
বাঘ: আমি মেয়েটাকে খাই, তুমি বাচ্চাটাকে খাও
মালঞ্চ: বাঘমামা, বাঘমামা, একটি মিনতি করি শোনো
আমার সোয়ামি অতি শিশু, এরে খেয়ে লাভ নেই কোনো
একে তোমরা ছেড়ে দাও
তার বদলে আমাকে খাও!
বাঘ: এই রে মাটি করলে, প্রথমেই মামা বলে ডেকে ফেললে
ভাগনীকে এখন কি করে খাই
তা হলে আর কাজ নাই

চলো বাঘিনী, অন্য শিকারে যাই!
বাঘিনী: আহা রে, তোমার স্বামী এমন শিশু হেন
তারে নিয়ে এই বনে এসেছ মা কেন?
মালঞ্চ: ভাগ্য যদি মন্দ হয়
সব পথই ভুল হয়!
বাঘ: চলো চলো, আমরা অন্য শিকারে যাই রাত রয়েছে বাকি
বাঘিনী: দাঁড়াও, আমরা চলে যাব, এরা খাবেটা কী?
মালঞ্চ: ব্যাঘ্র হলেন মামা, তুমি মোর মামী
বলে দাও, কী করে বাঁচাব মোর স্বামী
বাঘিনী: তাই তো! এদের বাঁচাবার কী উপায়?
মানুষের ছানা কী খায়?
মালঞ্চ: উপায় একটি আছে মাত্র
যদি পাই দুধ এক পাত্র
বাঘ: দুধ? দুধ? আহা বাছা, স্বামীকে খাওয়াবি?
গ্রাম থেকে ধরে আনি তবে একটা গাভী!
বাঘ আর বাঘিনী ডাকতে ডাকতে চলে গেল তারপর মালঞ্চমালা স্বামীকে সান্ত্বনা দেয়।
মালঞ্চ: চাঁদের গায়ে মেঘ জমেছে ফুঁ দিয়ে সরাই
সাথী আছে বনের বাতাস কোনো চিন্তা নাই
দুধের নদী ক্ষীরের সাগর পিঠে পুলির পাহাড়
এখনি তোমায় এনে দেব কী চাই বলো আর?
আবার বাঘ-বাঘিনীর গর্জন। ওরা ফিরে এসেছে।
মালঞ্চ: কী হল বাঘমামা, দুধ পেলে না?
বাঘ: গ্রাম অনেক দূরে,
তাতে দেরি হবে দুধ আনতে
হাতের কাছেই রয়েছে তো বাঘিনী,

তার দুধ দুয়ে নে না, ভাগিনী
মালঞ্চ: বাঘের দুধ?
বাঘিনী: দ্যাখ না খাইয়ে! দেখবি কত শক্তিমান
হবে তোর সোয়ামী যেন কার্তিকের সমান।
চ্যাঁক চোঁক করে দুধ দোওয়ানোর শব্দ। সেই দুধ খেয়ে চন্দ্রকুমার হেসে ওঠে।
কথক: বনের মাঝে কুটির বেঁধে থাকে মালঞ্চমালা
চন্দ্রমানিক পতি তাহার রূপে গুণে দশ দিকে উজালা
সদাই তাদের ঘিরে রাখে পশু পাখি সেথায় ছিল যত
সবার মাঝে মানুষ দুটি যেমন মৌচাকের মধুর মতো।
বাঘের দুধের এমনি গুণ বাঘ-বাঘিনী এমন প্রতিপালক
উনিশ দিনেই রাজার কুমার হল যেন দশ বছরের বালক।
মালঞ্চমালা: এই এই কোথা গেলে? প্রাণপতি, যেও না!
চন্দ্রমানিক: টুকি; মালঞ্চমালা আমায় ধরতে পারো না! আমায় ধরতে পারে না।
মালঞ্চ: অত দূরে যেও না প্রভু! বিপদ হতে পারে!
চন্দ্রমানিক: এই তুমি প্রভু বলো
তুমি আমার কে?
বলো না, তুমি আমার কে?
মালঞ্চ: ছিলাম কাহার কন্যা আমি গেলাম কাহার ঘরে
স্বপন সম সেসব কথা খানিক মনে পড়ে
চন্দ্রমানিক: কী আছে এই বনের শেষে, ওগো কন্যা বলো না!
জঙ্গল আর ভাল্লাগে না দূরে কোথাও চলো না!
মালঞ্চ: দূরে যেতে ভয় হয়, পাছে কেউ কেড়ে নেয় তোমাকে
চন্দ্রমানিক: কে আবার কেড়ে নেবে? কেনই বা কেড়ে নেবে আমাকে?
কী আছে বনের শেষে, আমার বাপ-মা থাকে কোথায়?
যদি তুমি পথ চেনো, চলো তবে চলে যাই সেথায়

মালঞ্চ: ভয় হয়, দূরে যেতে ভয় জাগে মনে।
কেন যাব, তার চেয়ে কত সুখে আছি এই বনে।
.
কথক: কিন্তু মালঞ্চমালার এই সুখ আর বেশিদিন সইল না
একদিন সেই পথে এসে হাজির হল মালিনী মাসি৷
মালিনী: চেনা চেনা লাগে যেন, ওগো কন্যা তোমার কী নাম?
মালঞ্চ: আমি সেই মালঞ্চমালা, মালিনী মাসি তোমায় প্রণাম
মালিনী: চিতায় পুড়ে মরিস নি তুই? কেমন করে বেঁচে ফিরে এলি?
সঙ্গে এই বালকটি কে? একে আবার কোথায় পেলি?
হাতে পতাকা, পায়ে পদ্ম, ছেলেটি বড় সুলক্ষণ
সন্দেহ নেই এ আমাদের রাজপুত্তুর বিলক্ষণ!
ওরে ওরে কী আনন্দ, কী আনন্দ আজ
লক্ষ টাকার পুরস্কার আমায় দেবেন মহারাজ!
চল, চল, চল...
কথক: তারপর তো মালিনী মাসির হাত ধরে মালঞ্চমালা আর
চন্দ্রমানিক ফিরে এল রাজ্যে। রাজা রানী শোকে তাপে
আধমরা হয়ে ছিলেন, খবর পেয়ে আনন্দে লাফিয়ে
উঠলেন। রাজ্য জুড়ে শুরু হল উৎসব। কিন্তু
মালঞ্চমালা: এমন সুখের দিনে কাঁপে কেন ক্ষণে ক্ষণে
আমার চোখের দুটি পাতা
বিপদ আছে কি আরো, কেউ বলে দিতে পারো
কোথায় আমার পিতা মাতা?
মহারাজা
(ঢাক ঢোলের মহড়া, মালঞ্চমালার কথা কেউ শুনছে না।)
মালঞ্চ: মহারাজ, আছে মোর কিছু নিবেদন

রাজা: হবে হবে পরে শুনব খন
মালঞ্চ: মহারাজ, কোথায় আমার পিতা মাতা?
রাজা: আছে তারা ভালো আছে, পরে শুনো সেসব কথা!
মালঞ্চ: মহারাজ, যদি অনুমতি পাই
একবার আগে যাই মম পিতৃগৃহে
রাজা:, , যাও না, চলে যাও, যতদিন খুশি
থাকো সেথা গিয়ে
মালঞ্চ: মহারাজ, আমি একাকী যাব কি অতদূর পথ
এমন গহন রাতে
কথা ছিল সেই দীনের কুটিরে রাজার কুমার
যাবেন আমার সাথে
রাজা: কথা ছিল? কার কাছে?
মালঞ্চ: আরও দুটি শর্ত বাকি আছে
রাজা: শর্ত? এমন সাহস কি তোর রাজাকে শোনাস শর্ত
কে কোথায় আছিস, এই ডাইনির চুলের মুঠিটা ধর তো!
মন্ত্রী: সে কি মহারাজ, এ মেয়েটি রাজবাড়ির পুত্রবধূ
পিতার কুটিরে একবার যেতে অনুমতি চায় শুধু!
রাজা: এত আয়োজন এত উৎসব ছেড়ে
আমার কুমার চলে যাবে আজ কোটালের কুঁড়ে ঘরে?
তোমরা শুনেছ এই মেয়েটির আহ্লাদ
যাও এক্ষুনি ডেকে আনো জহ্লাদ!
কোটালের মেয়ে বিষম কুটিলা আগে থাকতেই জানি!
দেখো ভালো করে এ মায়াবিনীর আসল চেহারাখানি
রাজকুমারের সাথে ছিল কত বয়সের ব্যাবধান
কী করে বা আজ হল দুইজনে এমন সমান সমান?

ডাইনি ছাড়া কি আর কেউ পারে ঘটাতে এসব কাণ্ড
যাও জল্লাদ, বনে নিয়ে গিয়ে কেটে ফেলো ওর মুণ্ড!
কথক: মাথাটি মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দিয়ে মারতে মারতে তাহারে
ঘাতকেরা বেঁধে টেনে নিয়ে এল খুব উঁচু এক পাহাড়ে
বিষম গভীর খাদের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিল সজোরে
মালঞ্চমালা খাদের মাথায় ঝুলে থেকে কাঁদে অঝোরে।
(মালঞ্চমালার কান্না)
এক দিন যায়, দুদিন যায়, তিন দিন যায়...
তারপর সেখানে এলেন বনদেবী
বনদেবী: গাছের মাথায় শুয়ে শুয়ে
কাঁদছে দেখি একটি মেয়ে,
তুমি কে?
মালঞ্চ: কেউ নাই যার এ সংসারে
সব গেছে যার ছারে খারে
আমি সে!
বনদেবী: ওমা, এযে মালঞ্চ, মোর বোনটি
কী করে হল দশা তোমার এমনটি
খুলে কও তো সব!
মালঞ্চ: কিছুই তো নেই জানাবার
সুখ-দুঃখ কোনো কিছু আর
এখন করি না অনুভব।
বনদেবী: হুঁ, এবার সব বুঝেছি
ধ্যান নেত্রে সব কিছু দেখেছি
সেই রাজা এত পাপী, এত অকৃতজ্ঞ?
তার রাজ্যে এখনি বাধাব দক্ষযজ্ঞ!

আয় তো রে সিংহ, হস্তী, ভল্লুক, ব্যাঘ্র
কে কোথায় রয়েছিস চলে আয় শীঘ্র!
(নানারকম জন্তুজানোয়ারদের ডাক। এর মধ্যে বাঘ-বাঘিনী ডাকতে ডাকতে কাছে আসে।)।
বাঘ: এ তো দেখি মালঞ্চমালা আমার ভাগিনী
চিনতে পেরেছিস একে বাঘিনী?
বাঘিনী: কেন, চিনব না ওকে আমি
ও মালঞ্চ, গেল কোথায় তোর সোয়ামী?
(মালঞ্চের কান্না)
বনদেবী: তোরা সবাই সাথে করে মালঞ্চকে নিয়ে যা
দেখিস যেন উচিত শাস্তি পায় সে পাপী রাজা!
কথক: ব্যাঘ্র বাহিনী মালঞ্চমালা আরও সব আসে সঙ্গে
নখী ও শৃঙ্গী যত প্রাণী ছিল ধায় সবে রণ রঙ্গে
তাই দেখে সেই রাজার রাজ্যে পড়ে গেল হুড়াহুড়ি
প্রজারা সভয়ে যে-যেদিকে পারে দৌড় দিল ঘর ছাড়ি
শেষে রাজা এসে অতি দীন বেশে দাঁড়ালেন করজোড়ে
রাজা: (কম্পিত কণ্ঠে) মালঞ্চমালা, ওগো মা মালক্ষ্মী ক্ষমা করো
তুমি মোরে
(বাঘের গর্জন)
মালঞ্চ: আরে রাখো রাখো আমাকে প্রণাম করতে দাও
অরণ্যের ভাই বন্ধু, এবার অরণ্যে ফিরে যাও।
কথক: তারপর?
ভয় দূর হল, ঘরে ফিরে এল পলাতক প্রজা সবে
এ রাজ্যখানি মেতে ওঠে ফের নতুন মহোৎসবে
কিছুদিন পরে রাজা সন্ন্যাস নিলেন, গেলেন বনে

চন্দ্রমানিক সবাকার প্রিয় বসল সিংহাসনে
মালঞ্চমালা সে দেশের রানী রূপে গুণে আলো করা
এমন সে দেশ হাসিতে খুশিতে সকলের মন ভরা।